জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং— ২০, ৪র্থ বর্ষ, ২০শে এপ্রিল ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার

THE JUMMA SAMBAD BULLEITN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Janasamhati Samiti

Issue No. 20, 4th year, 20th April, 1995 Thursday.

সম্পাদকীয়

বিগত দু'দশকের অধিক দিন ধরে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এই সুদীর্ঘ দু'দশকের অধিক সশস্ত্র আন্দোলনের লাভ-লোকসান নিয়ে হয়ত অনেকের মনে আজ নানা প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন যেখানে রুদ্ধ ও ব্যর্থ, সেখানে সশস্ত্র আন্দোলনই একমাত্র বিকল্প পথ। তাই আন্দোলনের সফলতা আনতে সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকে না। চলে দীর্ঘদিন ধরে। বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সুদীর্ঘ সশস্ত্র আন্দোলনের অভিজ্ঞতা।

মূলতঃ সকল স্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া কোন আন্দোলনে সফলতা আসে না। একমাত্র জাতীয় আন্দোলন বা গণআন্দোলনের রূপদানের মাধ্যমে বিজয়কে সুনিশ্চিত করা যায়। জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সফলতাও নির্ভর করছে দশ ভিন্ন ভাষাভাষী সকল স্তরের জুম্ম জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের উপর।

এই আন্দোলন কোন বিশেষ জাতিসত্ত্বার বা শ্রেণীর জন্য নয়। সমগ্র জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষা, ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিক হিসেবে সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও সকল প্রকার মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তাই এই আন্দোলনে দশ ভিন্ন ভাষভাষী জুম্ম জনগণের সক্রিয় ভূমিকা পালন একান্তই অপরিহার্য। বিশেষতঃ বিদ্যমান পরিস্থিতি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জুম্ম বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত যুব সমাজের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দাবী রাখে।

জাতীয় আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

● শ্রী জগদীশ

যে কোন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অপরিহার্য। যেহেতু বুদ্ধিজীবীরাই জাতীয় জীবনের সকল দিক তথা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতির চূড়ান্ত বিশ্লেষক। তাই তারা জাতির পথ প্রদর্শকও বটে। বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় সংকটে তাদের প্রাজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করে জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটান।

খুব বেশী অতীতের নয় মাত্র দু'দশক আগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাই এ সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের সম্মুকে উদ্ভাসিত। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর শোষণে যখন সারা বাঙালী জাতি চরম নিঃশেষিত ও সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত, এমনকি মাতৃভাষাকে যখন হারাতে বসেছিল তখন বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভবন করেন মূলতঃ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাই।

আর ৭১'এর মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল আরো উজ্জ্বল। এই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার করেছেন, দেশের প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ দেশাত্মবোধক গান গেয়ে জনগণ ও মুক্তিসেনাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। জাতীয় কবি-সাহিত্যিকরা দেশাত্মবোধক কবিতা, নাটক ও গান রচনা করে জাতীয় চেতনাকে আরো উজ্জীবিত করেছেন। চিত্রশিল্পীরা পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর বর্বরতা তুলে ধরেছেন তাদের তৈলচিত্রে ও চলচ্চিত্রে। বিগত '৯০ এর আন্দোলনেও স্বৈরাচারী এরশাদের পতনে তারা গৌরবময় ভূমিকা রেখেছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বিগত দু'দশকের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জুম্ম বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। আন্দোলনের গোড়ার দিকে গ্রামাঞ্চলে অবস্থানরত কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীই এগিয়ে আসেন। তাই আশির দশকে চট্টগ্রামের ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জি ও সি মেজর জেনারেল মঞ্জুর বলেন, "It is Headmaster's War", উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা হাই স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া সমিতির আরো অনেক উচ্চ স্তরের কর্মী বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষক শ্রেণীই মূলতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন এবং তারা জুম্ম যুবশক্তিকে সংগঠিত করেছিলেন।

অবশ্য এ আন্দোলনে বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাবেশ ঘটেছে। জুম্ম ছাত্র-শিক্ষক-কৃষক জনতা সকলে আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু শহরে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা খুবই নগণ্য বলা যায়। অথচ জুম্ম জনগণের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের বুদ্ধিমত্তা ও মানবিক সচেতনতা সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হওয়ার কথা। আর সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি তাদের তীক্ষ্ণ হওয়ার কথা। জুম্ম জনগণের এই চরম বঞ্চনার নিরসন ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তাদের মেধা-প্রতিভাই যুবশক্তিকে আরো সংগঠিত ও উজ্জীবিত করতে পারে।

কিন্তু ইহা অত্যন্ত বাস্তব যে, নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক উভয় আন্দোলনে এই জ্ঞানবানদের ভূমিকা অতিশয় হতাশাব্যঞ্জক। তাই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বার্ষিকী উৎযাপন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষিত জুম্ম বুদ্ধিজীবীদের পাওয়া ভার। বরঞ্চ এসব অনুষ্ঠানে প্রগতিশীল বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বে-আইনীভাবে ধৃত নিরপরাধ জুম্ম বন্দীদের রীট আবেদনের জন্য বাঙালী

আইনজীবীদের সহানুভূতির উপর নির্ভর করতে হয়। অধিকন্তু পশ্চাদপদ জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোটার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রাজপথে মিছিল ও সামরিক কম্যাণ্ডারদের অফিসে লাইন দিতে হয়। প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধাদি ও নিজ বাস্তুভিটা ফেরত পাওয়ার জন্য ভোতা অনুভূতিসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের কাছে কাকুতি-মিনতি করতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ ইহা অত্যন্ত লজ্জাকর যে, বিগত আশির দশকে যখন সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম উচ্ছেদ অভিযান চলছিল, ৫০ হাজার জুম্মকে যখন বাস্তুভিটা ছেড়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছিল, পানছড়ি, চঙড়াছড়ি, বাঘাইছড়ি, লংগদু, লোগাং ও নান্যাচরে যখন গণহত্যা চলেছিল তখন এই তথাকথিত জ্ঞানবান বুদ্ধিজীবীরা দুঃস্বপ্নে শিউরে উঠেছিল মাত্র। আর শহরে চাকুরেরা এ সব দুঃসংবাদে সুরার নেশা করে উৎকণ্ঠামুক্ত হয়েছিল। তারা নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের নিরাপদ জীবনের জন্য ছাত্র পরিষদের আয়োজিত মিছিলে যেতে ভয় করে, পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে দেশপ্রেমের বদান্যতা প্রকাশ করে। এই ছিল জুম্ম জনগণের চরম দুর্দিনে জুম্ম বুদ্ধিজীবী ও চাকুরেদের নিদারুণ অনুভূতি।

কিন্তু শাসক-শোষক গোষ্ঠীর কালো হাত কাউকে ছাড়ে না। সমগ্র জুম্ম জাতির ভাগ্য যেখানে বিড়ম্বিত শহরে চাকুরে ও বুদ্ধিজীবিদের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তাই ১৯৮৮ সালে মানিকছড়িতে শান্তিবাহিনীর আক্রমণে একদল সেনা বিধ্বস্ত হলে চট্টগ্রামস্থ ও রাঙ্গামাটিস্থ জুম্মদের জীবনে নেমে আসে এক বিভীষিকা। সেদিন চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি ও রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম গামী বাস-কোচ থেকে জুম্ম যাত্রীদের ঘাগড়ায় পাইকারীভাবে নামিয়ে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। এই ধর-পাকড়ের সময় কোন জুম্ম রেহাই পায়নি। চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি আসার পথে অনেক সরকারী গেজেটেড চাকুরেও এ দুর্ভাগ্য এড়াতে পারেনি। একমাত্র রাঙ্গামাটির প্রখ্যাত ডাক্তার অদ্যুৎ কুমার দেওয়ান নাকি এক উচ্চপদস্থ বাঙালী সামরিক অফিসারের শ্বাশুড় সুবাদে নির্যাতন থেকে রেহাই পান। আরো পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে তৎকালীন সাংসদ বিনয়ের অবতার শ্রীবিনয় কুমার দেওয়ান রাঙ্গামাটি সফরে ছিলেন। তিনি জুম্মদের এই ধর-পাকড়ের কোন প্রতিকার করতে না পেরে অনেকটা অপমানিত হয়ে ঢাকায় ফিরে যান। এ ঘটনা ছাড়াও ১৯৯২ সালের ২০শে মে তারিখে রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় মুসলমান বাঙালীরা জুম্ম অধ্যুষিত ট্রাইবেল আদাম ও বনরূপায় শতাধিক জুম্ম ঘরবাড়ী লুট ও জ্বালিয়ে দেয়। এ দুটো ঘটনায় রাঙ্গামাটিতে জুম্মদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে শহরে চাকুরে ও বুদ্ধিজীবীদের টনক কিছুটা নড়ে। কিন্তু তাও ছিল অত্যন্ত সাময়িক অনুভূতি। তাদের এই অনুভূতি তাদেরকে আরো পলায়নমুখী করে তোলে। ফলে তারা আরো দূরে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আরো দূরে চট্টগ্রাম-ঢাকামুখী হয়ে পড়ে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের নিভৃত বিল্ডিং-এ ভিসিআর দেখে তারা যেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বীভৎস দৃশ্যকে ভুলে যেতে চায়। কি জঘণ্য!

বলা বাহুল্য যে, শহরমুখী যুবশক্তির গতি-প্রকৃতি খুবই নৈরাজ্যজনক। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে যখন জুম্ম ছাত্র যুবক জনতা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়েছে, রাজপথ বেছে নিয়েছে, তখন এদের একটা বড় অংশ নেশা ও ব্লু-ফিল্ম দেখে দিন কাটাচ্ছে। সাংবিধানিক ও মানবিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে অভিশপ্ত বেকার জীবনকে শ্রেয় মনে করছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের লেজ ধরে চাকুরে জীবনের সুখময় স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে। সরকারী চাকুরী ও ছা-পোষা জীবনই তাদের একমাত্র কাম্য। কি নির্লজ্জ।

সমগ্র জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। একমাত্র আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের এই অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। অধিকার আদায় করতে হয়। জুম্ম জনগণকেও এই অধিকার আদায় করতে হবে সংগ্রামের মাধ্যমে। জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হয়ে বিগত দু'দশকের অধিক

সশস্ত্র আন্দোলন করে যাচ্ছে। সমগ্র জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই সশস্ত্র আন্দোলন চলবে। আর এই আন্দোলন চালানোর দায়িত্ব সকল স্তরের জুম্ম জনগণের। জনসংহতি সমিতি এই আন্দোলনের কাণ্ডারী মাত্র। তাই এই আন্দোলনে সকল স্তরের জুম্ম জনগণের স্বীয় ভূমিকা রাখার দায়িত্ব এসে যায়।

হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। খুঁজে পাওয়া সংগ্রাম ॥

● শ্রী সুপ্রিয়

চুরাশি সালের শেষ দিকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির প্রবল আশা নিয়ে ক'জন বন্ধুর সাথে ক্যাম্পাসের কাছাকাছি ভাড়া বাসায় মেস করে থাকতো জীবন। অন্য বন্ধুদের তিন জনই আই এস সি পরীক্ষার্থী। তাই ক্যাম্পাসের হলগুলোতে অবস্থানরত বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করতে প্রায়ই একা আসা যাওয়া করতো জীবন। কোন কোন দিন অবশ্য দিলীপ, সুচিত্ত ও ম্যাজিক্‌ক মিলে চার জনেই হলে বেড়াতে যেত। বিকালে আড্ডা-জমত আলাওল হলের উত্তর পার্শ্বের কর্টেজগুলোতে বিকেলে আড্ডার আসরে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা পায়ে হেঁটে কখনো পায়ে চলা পথ কখনো বা রেল লাইন ধরে রুমে ফিরত ওরা। বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল দিন। ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জীবনের বেশ ভয় ছিল। শেষ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষায় টিকে যেতে না পারলে ভবিষ্যৎটাই অনিশ্চিত। শত শত মেধাবী ভর্তিচ্ছুদের ভেতর নিজেকে অসহায় মনে হত। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে নুতন এক জীবন শুরু হয় জীবনের মেসের অন্য বন্ধুদের ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশনের পাশে "শোভন ছায়া" কর্টেজে চলে যায় সে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক স্টাফদের ব্যক্তিগত মালিকানায় অনেক ঝুপড়ি ধরণের কর্টেজ তৈরী করা হয়েছে। ক্রেমলিন, হোয়াইট হাউস, বুশ হাউস, পদ্মা, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি নানা নামে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী অসংখ্য ছাত্রাবাস। "শোভন ছায়া" কর্টেজের মালিক বাংলা বিভাগের ডঃ দেলোয়ার হোসেন সিট ভাড়া মাসিক ৭০ (সত্তর) টাকা হারে গণিত বিভাগের দেবাশীষসহ কর্টেজ জীবন দিয়েই জীবনের ক্যাম্পাসের দিনকাল শুরু। পুরণো সেই মেসের বন্ধুরা সবাই আজ বিচ্ছিন্ন। দিলীপ বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে কর্ম সংস্থানের লাগামহীন যানে চড়ে বেকারত্বের দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে। সুচিত্ত ছোট খাট একটা চাকুরী নিয়ে উত্তরবঙ্গে। আর ম্যাজিক্‌ক ! সেই যে কবে কানাডা চলে গিয়েছে তার আর কোন পাত্তা মিলেনি। কর্টেজ জীবনে পরে আরো যোগ দেয় মনীষ। মনীষও আজ বহু বহু দূরে। গিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাতে স্কলারশিপ নিয়ে। ওখানে থাকতে থাকতেই পরিবারসহ ইমিগ্রান্ট হয়ে নিউজিল্যাণ্ড পাড়ি জমিয়েছে। ডিপার্টমেন্টের অন্য দু'জন বন্ধু শাহরিয়ার, বাবলু ও হুমায়ুন এখন ব্রাসেল্‌সে। ওরা জীবনের শুধু ঘনিষ্ট সহপাঠিই নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবেও একান্ত কাছাকাছি। নিপীড়িত ও নির্যাতিত খেটে খাওয়া মানুষের জন্য সংগ্রাম করার কথা বলত ওরা। তাদের সাথেও আজ আর যোগাযোগ নেই। ভবিষ্যতে যোগাযোগ হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। এসব ভাবতে ভাবতে জীবনের আর ঘুম আসে না। পাহাড়ের দেশে রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। গভীর অরণ্যে নেমে আসে "হাড় আউট" এর শীতকালীন কষ্টকর রাত। চারদিক বরফ-শীতল পরিবেশ। ভুলংতলী মৌনের এই নিষিদ্ধ, নিভৃত অরণ্যে কনকনে শীত হৃদপিণ্ডেও কামড় দেয় যেন। একটা ছেড়া পুরনো কম্বল আর বুরগী (গিলাপ) গায়ে জড়িয়ে

শীতের মোকাবেলা করার ব্যর্থ চেষ্টা অব্যাহত থাকে। মশারী নেই। উপরে নেই কোন ছাদ। খোলা মহাশূন্যই ছাদ উন্মুক্ত মাটির পৃথিবীই বিছানা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রকৃতির সব কোলাহল বুঝি বা জমে গেছে। কুয়াশা জমতে জমতে শিশির বিন্দু। অতঃপর পাতায় পাতায় টুপটাপ করে পড়ার নিক্ষিপ্ত শব্দ ছাড়া রাতের এই নিঃশব্দটাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোন নিশিথ পাখীরও ডাক শোনা যাচ্ছে না। পাশে মুকুলদা আর নিটোদা'রা কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দই পরিপার্শ্বের গোটা পরিবেশটাকে গুমোটভাব এনে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও মুকুলদা যুদ্ধের কিছু স্মৃতিচারণ করছিল। অদ্ভুত মনে হয় এ মানুষদের অনেক কিছু ত্যাগ করে জীবন বাজী রেখে আজ তারা দীর্ঘ বছর জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নিবেদিত সৈনিক। বছরের পর বছর এরা গেরিলা সংগ্রামে কষ্টকর সময় পাড়ি দিয়েছে স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সংগ্রামী চেতনা তাদের নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ক্লান্তিহীন অথচ কণ্টকাকীর্ণ লড়াই পরিচালনা করে যাচ্ছে। না মোটেই ঘুম আসছে না জীবনের। খানিকটা দূরে বড় একটা চাপালিশ গাছের তলায় লালন সেন্ট্রি দিচ্ছে। রাত দু'টো পনের মিনিটে সেন্ট্রি বদল হবে। পালাক্রমে সেন্ট্রিতে যাবে দেব, উদয়নদা। ভোর রাতে জীবনের ডিউটি আসবে। ক্রমেই ঘুটঘুটে অন্ধকার আর নিঃশব্দতা গ্রাস করে যায় ভুলংতলী মৌনের আশপাশ।

সবে ক্লাশ শুরু হয়েছে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বন্ধুদের সাথে তখনো পুরোপুরি জানাশুনা হয়নি। সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশজন জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। চট্টগ্রাম ভিত্তিক যে জুম্ম ছাত্র সংগঠনটি ছিল তা থেকে নবীনবরণ করা হয়নি তখন। তবুও প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে একটা সম্মিলনী করার লক্ষ্যে মূলতঃ শিবা আর অপ্রিয় পিকনিকের উদ্যোগ নেয়। পিকনিক স্পট পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত। যথারীতি আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্ব শুরু হলে প্রত্যেকেই যে যার বক্তব্য তুলে ধরে পরিচয় দেয়। কম-বেশী সবাই জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথাও প্রকাশ করল। শিক্ষা জীবন শেষ করে জুম্ম জনগণের কল্যাণে অবদান রাখার অঙ্গীকারের সুর শোনা গেল অনেকের মুখে। যেহেতু শিক্ষিত যুব সমাজেই পারে কোন জাতির ভাগ্যোন্নয়নে অধিকতর আত্মত্যাগ করতে। উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র সমাজের উপর স্বাভাবিকভাবে বর্তে যায় জাতীয় জীবনের অপরিসীম দায়-দায়িত্ব। অধিকার আদায়ের দুর্গমনীয় পথে তারাই এগিয়ে যাবে দৃপ্ত শপথ নিয়ে। এটাই যুগের দাবী, এটাই নিয়ম। সত্তর সালের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ছাত্র সমিতি স্বাধীকার অর্জনের যে সংগ্রামের ডাক দিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল যেভাবে, ঠিক একইভাবে নব প্রজন্মের শিক্ষিত যুবকরা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে এটাই স্বাভাবিক। পূর্বসুরীদের আত্মত্যাগ উত্তরসুরীদের প্রেরণা যোগায়। তাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের ফলেই পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। তাই আজকের দিনের জুম্ম জনগণ যেভাবে যে পরিমাণে আত্মত্যাগ করবে ঠিক সেই পরিমাণে আগামী দিনের প্রজন্ম উন্নত হবে—সুখী হবে। এভাবেই একটা জাতি উন্নততর অবস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। ভবিষ্যতের সবকিছুই নির্ভর করছে বর্তমানের উপর। কাজেই সেদিন লেখাপড়া ফেলে স্বাধিকারের স্বপ্ন লালন করে যারা সংগ্রামে নেমেছিল তাদের জন্যই আজকের বন্ধুরা লেখাপড়া করতে পারছে। আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করতে গিয়ে আজ যারা বড় আমলা, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ইত্যাদি কিছুই হতে পারেনি, একমাত্র তাদের জন্যেই সে যুগের অন্য বন্ধুরা তাই হতে পেরেছে। কলেজ জীবনের অনেক বন্ধুর মত সুশীল, নীলব্রত বা বিল্টুরা আন্দোলনে আত্মত্যাগী হয়েছে বলেই প্রদীপ, জীবন বা শিবাদের মত অনেক বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে। শিলা, উর্মিদের মত অনেক বান্ধবী আজ উচ্চ শিক্ষায় আলোকিত, যেহেতু লালসা, জ্ঞানরুপাদের মত অসংখ্য বান্ধবী অনেক কিছু ত্যাগ করে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। যেমনি রাত দিনের কিংবা অন্ধকার আলোর পূর্বশর্ত তেমনি যেন সব কিছুই সম্পর্কিত।

সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন সবাই যেন শপথ নিয়েছিল ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ হবে। অঙ্গীকার আর আনন্দ সেদিন সবাইকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনের পর বিকেল বেলায় গান গেয়ে শোনায় বান্দরবানের স্বল্পভাষী বন্ধু নীলু। ভূপেন হাজারিকার "আয় আয় ছুটে আয় সজাগ জনতা" গানটি বেশ নাড়া দিয়েছিল সবাইকে। পতেঙ্গার সেই প্রথম পিকনিকের আনন্দঘন স্মৃতি জীবনকে আরো আলোড়িত করে। পুলকিত শিহরণে হারিয়ে যাওয়া ভালই লাগে। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনাকালীন তিনবার পিকনিক করতে বঙ্গোপসাগরের এই বিস্তীর্ণ উপকূলে আনন্দমুখর সময় কেটেছে। তবে ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম পিকনিক থেকেই অনেকের সাথে মেলামেশা এবং বন্ধুত্ব। সেই থেকেই সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে যাওয়া। ছাত্রবন্ধুদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও সাংগঠনিক কার্যক্রমে জড়িয়ে নেবার জন্য উৎসাহিত করা শুরু হয় তখন থেকে। তাই উপলক্ষ্য পিকনিক হলেও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সবাইকে সংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ। চিত্ত বিনোদনের ভিতর দিয়ে চেতনার বিকাশ আর চিন্তার সমন্বয়। সেই চেতনা হল জুম্ম জাতীয়তাবাদের, জাত ও দেশপ্রেমের। শোষিত, বঞ্চিত সংখ্যালঘু পাহাড়িয়া জাতিসমূহের অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষিত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বেড়িয়ে আসা শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সংহতি স্থাপন। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের অনুভূতিগুলো মেলানো। নিজেদের ভ্রাতৃপ্রতিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করা। সবার মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতপ্রেমের রোগ ছড়িয়ে দেয়া। অর্থাৎ জাতীয় চেতনাবোধ জাগিয়ে দেওয়া। এই দেশপ্রেম ও জাতপ্রেমের রোগ যতবেশী সংক্রামিত করা যায় ততই ভাল বলে বিশ্বাস ছিল সংগঠকদের। এ কাজে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে অপ্রিয় ও শিবা। পরবর্তীতে প্রদীপ, প্রশান্ত, মংখোয়াই, শিশির, সুইমু, লীলা, দেব ও শক্তিসহ অনেইকেই বিপুল উদ্যোমীর ভূমিকায় এগিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক জুম্ম ছাত্র সংগঠনটি অধিক মাত্রায় সুসংঘঠিত ও গতিশীল করতে নিরলস নিয়োজিত ছিল এরা সবাই যদিও শেষদিকে খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ইব্রাহিমের কূটচালে দিশেহারা হয়ে প্রশান্ত চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে সংগঠন থেকে বেরিয়ে যায়। অথচ রাজনৈতিক সংগঠনটির পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন "হিল লিটারেচার ফোরাম" করার সময় প্রশান্তও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। আর তখন প্রাণভরা উৎসাহ, উদ্দীপনা আর সৃজন প্রয়াস সবাইকে সর্বক্ষণ তাড়িত করত। মনে ছিল অসীম স্বপ্ন আর সৃষ্টির প্রেরণা। দ্রুতই এগিয়ে গিয়েছিল সাংগঠনিক কার্যক্রম। জুম্ম সমাজের গতানুগতিক সাংস্কৃতিক ধারাকে বদলে দিয়ে এক নূতন সংগ্রামমুখী মাত্রা যোগ করতে চেয়েছিল সবাই। প্রচলিত সাংস্কৃতিক চর্চার ধারাকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নতুন গতিধারার জন্ম দেবার যে প্রেরণায় সেদিন ওরা আপ্লুত ছিল আজ তা শুধু মৃত স্মৃতি। যে স্মৃতি প্রেরণা দিতে পারে না, সৃষ্টি করতে পারে না কিছুই, যার শিক্ষণীয় কোন মূল্যই নেই সেই স্মৃতি বন্ধ্যা, সে স্মৃতি মৃত। অথচ প্রদীপের মত বন্ধুবৎসল, উদ্যোমী, প্রশান্তের মত দায়িত্বপরায়ণ, শিবাদের মত সৃষ্টিসুখে উল্লাসী তরুণ সৈনিকদের জন্ম দিয়েছিল সেই সময়, সেই সমাজ। সমাজ আর সময়ের প্রয়োজনেই উদ্যোগী প্রতিভার জন্ম, নূতন প্রজন্মের আগমন ; অথচ স্বার্থের প্রয়োজনেই তারা প্রস্থান নেয়, হারিয়ে যায়। নিজেকে গুটিয়ে নেয় একে একে। সেই সময় সেই স্মৃতি মহাকালের গর্ভে অবলীলায় হারিয়ে যায় কিন্তু সময় একদিন যাদের জন্ম দেয়, আগমন ঘটায়, তাদের প্রয়োজন তো শেষ হয়ে যাবার কথা নয়।

আমাদের দুর্ভাগা সমাজ, এই দুঃসময়ে তো তাদের প্রয়োজন দাবী করে। যারা শুধু নিজের যোগ্যতার গুণে নেতা হওয়ার কথা মনে করে তারা নিঃসন্দেহে গোবেট, বিশ্বাসঘাতক, অপরাধীও বটে। যে সন্তান আজ তিল তিল করে শিক্ষিত হচ্ছে বা নেতার স্বীকৃতি অর্জন করছে সে কেবলমাত্র তার মেধা বা অভিভাবকের দেয়া অর্থে শিক্ষার আলো কিংবা নেতার যোগ্যতা অর্জন করে না। পরিপার্শ্বের সমাজ, সময়ই তাকে লালিত করে। শিক্ষা দেয়। যোগ্যতা দেয়। তাই একজন শিক্ষিত বা

যোগ্যতাসম্পন্ন সচেতন লোকের দায়-দায়িত্ব কেবল মা-বাপের পালন কিংবা নিজের আখের গোছানোর সীমা-বদ্ধ থাকতেই পারে না। রবির কথাটি তাই জীবনের বার বার মনে পড়ে। "একজন নেতা কেবল তার স্বীয় গুণেই নেতায় পরিণত হয় না। আমাদের সমাজই তাকে নেতা হিসাবে গড়ে তোলে। এজন্য গোটা সমাজ অসংখ্য উপাদান, মূল্যবান পরিবেশ সৃষ্টি করেই নেতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই একজন নেতার ব্যক্তিগত কিছুই থাকতে পারে না। নেতার সমস্ত কিছুই সমাজের অধীন। তাই সমাজের কাছেই একজন নেতা দায়বদ্ধ।" অনুরূপ আপাতদৃষ্টিতে যে ছাত্র বা ছাত্রীকে আজ তার অভিভাবক বহু কষ্টে অর্থ যোগান দিয়ে শিক্ষিত করে তুলেছে সে যদি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে তবে তা হতাশাব্যঞ্জক। কাজেই যারাই আজ স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে তাদের অবশ্যই এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, জুম্ম জনগণই কঠোর সংগ্রাম করে তাদের শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে। নিবৃন্তে, নিঃস্বার্থে কাজ করে যায় আমাদের গোটা সমাজ। চাকুরী পাওয়া, ব্যবসা করতে পারা, পড়াশুনা করতে পারা, বিভিন্ন কোটা ভোগ করা, স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশ যাওয়া, আন্দোলন করতে পারা ইত্যাদি সব-কিছুই লড়াইরত জুম্ম সমাজের অবদান, সংগ্রামের মূল্যে পাওয়া ফল। শত শত মা-বোনের ইজ্জত, হাজার হাজার মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে যাই হোই না কেন আমরা সবাই তাদের কাছেই ঋণী যারা পরোক্ষে ভূমিকা রাখে।

আজ অতি আশার কথা যে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন জোরদার হতে চলেছে। শহর থেকে পাহাড়ের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে আন্দোলনের ঢেউ। আমাদের এ যুগের সূর্য সন্তানরা ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছে অসীম সাহসে। শত শত আত্মপ্রত্যয়ী ছাত্র যুবক বেরিয়ে এসেছে সরকারী নির্যাতনের ব্যূহ ভেঙ্গে। অগনিত সামরিক স্থাপনার আতংকময় কারাগার ভিঙিয়ে আসছে তারা নির্ভীকভাবে। নিপীড়ক বাংলাদেশ সরকারের সামরিক অসামরিক ব্যবস্থার সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এ সময়ের সাহসী যোদ্ধারা জেল জুলুম, নির্যাতন এমনকি মৃত্যুকেও পরোয়া না করে জুম্ম ছাত্র সমাজ রাজপথে নেমে এসেছে। জুম্ম জনগণের মনে এখন আশার সঞ্চার হয়েছে। হতাশার অন্ধকার মেঘ খসে পড়েছে। এ সবিই সময়ের দাবী। সমাজের অবদান। আমাদের অবহেলিত, অত্যাচারিত জুম্ম সমাজের গর্ভে জন্ম নিয়েছে এ নব প্রজন্মের প্রাণতেজোময় সহযোদ্ধারা। সীমাহীন কষ্টে মা যেমন ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করে তিল-তিল যন্ত্রণাময় সময় পেরিয়ে শিশুকে জন্ম দেয় তেমনি আজকে যে তরুন ছাত্ররা আন্দোলনের ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ যাত্রায় এগুচ্ছে তাদেরও জন্ম দিয়েছে শত সহস্র আশাবাদী মা অর্থাৎ আমাদের সমাজ। কাজেই সমাজের সাথে তারা কখনোই বেইমানী করতে পারে না। সংকীর্ণ স্বার্থের পংকিল আবর্তে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করার অধিকার তাদের নেই। আমৃত্যু সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদের জন্মের স্বার্থকতা। কিন্তু তেমনটিতো অধিকাংশের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। জীবনরা এ যাবত অনেককে দেখেছে। সবাই একে একে আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সরে যেতে থাকে। কেউ নীরবে কেউ বেইমানী করে। নইলে শিবা, শিশির, দেব, নির্মল, মংখোয়াই, শক্তিপদ কিংবা পুষ্পের মত প্রতিবাদী বন্ধুরা কেন যুদ্ধে এলো না। প্রশান্তের মত উদ্যোগী বন্ধু কেনই বা সংগঠনে কুটারাঘাত করে আন্দোলনের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ সব ভাবতে গেলে জীবন বেশ ভারাক্রান্ত বোধ করে বৈকি। একদিন সবাই একসাথে কত স্বপ্নই না দেখেছিল। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের মহান সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে যাবে সবাই। শত শত অসহায় জুম্ম মা-বোনের বীভৎস ধর্ষণের কালিমা ঘুছাতে, সহস্র ভাই-য়ের আত্মবলিদানের ঋণ শোধ করতে আজীবন সংগ্রা ম টিকে থাকবে। সানিদা'র লেখাটি বেশ মনে পড়ে। "জুলো-দা, শান্তি আর অনিল তঞ্চঙ্গার আত্মবলিদান পাভেলকে যেমন বিপ্লবে টিকে থাকার প্রেরণা যোগায়নি, তেমনি জীবন আর অপ্রিয়দের নিরন্তর সংগ্রামী কর্মকাণ্ড অন্য

বন্ধুদেরও আন্দোলনে নিয়ে আসার চেতনা যোগাতে পারেনি।" এভাবেই সমীকরণ মিলিয়েছে জীবন এতদিন। তা না হলে সেই সহযোদ্ধা বন্ধুরাও নিশ্চয়ই আন্দোলনের মূল স্রোতধারায় চলে আসত।

উনিশ শ ছিয়াশি সালের এপ্রিল- মে মাস। পার্বত্য চটগ্রামের সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে তখন বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জুম্মদের গ্রামে গ্রামে বেপরোয়া আক্রমণ চলছে। খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা ও পানছড়ির বিভিন্ন এলাকায় চলছিল ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলা। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ছারখার করে দেয় সরকারী বাহিনী। এমনকি একটি লোমহর্ষক গণহত্যার অভিযান চলে পানছড়িতে। এতে অনেক নিরীহ মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। বিভীষিকাময় ঘটনায় পালিয়ে যাবার সময় নির্মমভাবে নিহত হন জীবনের বন্ধু ভবেশের বাবা। চরম উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছিল হলে অবস্থানরত জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী। সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলিমদের এই বর্বরতায় জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী সবাই বিমর্ষ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সেদিন। অনেকের মত ভবেশও শপথ নিয়েছিল—এই নির্মমতার প্রতিশোধ নেয়া চাই। মরণপণ সংগ্রাম করার বুলি অনেকেই আউড়িয়েছিল। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। পরের ঘটনা আরো মর্মান্তিক। যে সেনাবাহিনীর জল্লাদী হামলার শিকার হয়ে ভবেশের পিতা নিহত হন সেই সেনাবাহিনীর করুণার পাত্র হয়ে ভবেশ পরবর্তীতে চাকুরী গ্রহণ করে। পিতার সুযোগ্য সন্তান কিভাবে জন্মদাতার রক্তের সাথে বেইমানী করে ভাবতে অবাক লাগে। এর চেয়ে বিকৃত ও ধিকৃত ঘটনা আর কি থাকতে পারে জীবন আজো ভেবে পায় না। উনিশ শ উননব্বুয়ের ৪ঠা মে' তে লংগদুর গণহত্যায় ঢাকা ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়নের এককালীন প্রতিবাদী সংগঠক পুতুল্যের মা যখন নিহত হন তখন আজকের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিবাদের মৌন মিছিলে সে যায়নি। প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন প্রশান্ত ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ছাত্রবন্ধুরা। তৎকালীন অন্যতম সংগঠক সেই পুতুল্যেও সরকার তথা সেনাবাহিনীর উচ্ছিষ্ঠ চাকরী নামক টোপ গিলে মায়ের মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে দিব্যি সুখী জীবন কাটাচ্ছে। কি বিচিত্র পৃথিবী ! বিচিত্র মানুষের বেহয়াপনা। তাই সুবিধাবাদ, আপোষকামীতা কিংবা দালালীপনা গণহত্যার চাইতেও নির্মম। বেইমানী আর বিশ্বাসঘাতার কি বিচিত্র রূপ ! কি নির্মম সেলুকাস।

উনিশ শ আটাশি সালের ৮ ও ৯ই আগষ্ট বাঘাই ছড়ি এলাকায় সংঘটিত হয় পর পর অনেকগুলি অত্যাচারের ঘটনা। এ সব ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে একটা প্রচার পত্র ছাপানোর উদ্যোগ নেয় হলের জুম্ম ছাত্ররা। প্রচারপত্র ছাপাতে কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে জুম্ম চাকুরীজীবীদের কাছে যাওয়া হয়। এক জুম্ম ভাল চাকুরে যিনি ১৯৮০ সালে সংঘটিত কলমপতি গণহত্যার সময় উদ্বাস্তু হয়ে পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর নিকৃষ্ট করুণায় ভাল চাকুরী পেয়েছিলেন তিনি নাকি মাত্র ২০ টাকা সাহায্য করেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি বাঘাইছড়ি ঘটনার কিছুদিন পরেই গোটা পরিবার নিয়ে প্লেনে ঢাকায় প্রমোদ ভ্রমণে গিয়েছিলে। হাজার টাকা খরচ করে উড়োজাহাজে চড়তে আমাদের সমাজের এই মানুষরা যত না গর্বিত, গণহত্যায় নিহত স্বজনদের উদ্দেশ্যে ২০ টাকা সাহায্য করতে ততটা লজ্জিত নয়। এমনি কত যে জঘণ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জীবন আজ সেইসব ঘটনার কথা মনে পড়লে পীড়িত বোধ করে।

উনিশ শ নববুয়ের ডিসেম্বর মাস। দেশব্যাপী গণআন্দোলনের জোয়ার। বাংলাদেশের গোটা ছাত্র সমাজ তখন স্বৈরাচার হটানোর আন্দোলনে রাজপথে। যতদিন স্বৈরতন্ত্রের পতন হবে না, ততদিন ঘরে না ফেরার ঐতিহাসিক শপথ নিয়ে বাংলার দামাল ছাত্র সমাজ স্বৈরাচারী সকল নিপীড়নযন্ত্রের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরাচারী ক্ষমতার গদিতে তখন তাল মাতাল অবস্থা। সুদূর ইউরোপ থেকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" নামের

এক আন্তর্জাতিক সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির সরেজমিনে তদন্তে আসে। এই কমিশনকে পার্বত্য এলাকায় সাহায্য করতে জীবন আর অপ্রিয় বিশেষ তৎপর হয়। ঢাকাতে এই কমিশনকে রিসিভ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের সার্বিক পরিকল্পনায় সহ যোগিতা দেয়। চট্টগ্রামে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন যখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জি, ও, সি'র সাথে যোগা-যোগ করেছিলেন তখন হোটেল সৈকতে জীবনরা আবার তাদের সাথে দেখা করে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত করায়। চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত জুম্মদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে কমিশনের মিটিং এর আয়োজন করতে চেষ্টা চালানো হয়। সম্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যাই হোক না কেন মনতোষ বাবুই প্রথম এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। মনতোষ বাবুকে একজন সাচ্চা জাতীয়তাবাদী বলা যায়। তিনি আগ্রাবাদস্থ বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় বসবাসরত জুম্মদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কমিশনের সাথে মিটিং করার জন্য উদ্যোগ নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হন। স্বার্থের জন্য কেউ সাড়া দেয়নি। দুঃখ করে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা তো বাবা যুবক, তোমাদের অনেক জীবন বাকী। তোমাদের বেশী রিক্স নেয়া উচিত নয়। রিক্স নেবো আমরাই যারা আজ বুড়ো হয়ে গেছি। আমরা তো জীবন, যৌবন, ভোগ-বিলাস সবই দেখেছি। তোমাদেরও সুন্দর অনাগত ভবিষ্যৎ রয়েছে। তাই তোমাদের আগেই আমাদের মরা উচিত। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমা-দেরই বেশী ত্যাগ করা উচিত অনেক কিছু। আগামী প্রজন্মের জন্য পুরাতন প্রজন্মের প্রয়োজনে মৃত্যুর ঝুকিও নেয়া উচিত।" মনতোষবাবুর এই উৎসাহব্যঞ্জক কথাটি মনে রাখার মত। আমাদের সমাজে এ রকম বৃদ্ধের সংখ্যা অতি নগণ্য। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, পরবর্তী পর্য্যায়ে মনতোষবাবুকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অন্যায়ভাবে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। চট্টগ্রাম কারাগারে যখন সাজানো অভিযোগে আটক রাখা হয় তখনো সদা উদ্যোগী, নির্ভী-বান ও অন্যায়ের বিরোধী এ বৃদ্ধ লোকটি নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

নব্বুয়ের প্রবল গণ আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হলে সারা দেশের মানুষের স্বস্থির নিঃশ্বাস ফিরে আসে। বলতে গেলে মোটামুটি একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন জনগণও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সর্ব-স্তরের মানুষের একটি ফোরাম গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯শে ডিসেম্বর ঢাকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে গণধিকৃত পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ বাতিল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবীতে মিছিল ও সভা সমাবেশের পর পরই অনেক জুম্ম ছাত্রবন্ধু চট্টগ্রামে চলে আসে। বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন পেশার জুম্মদের সংগঠিত করার জন্য গণসংযোগ চলতে থাকে। তখন চট্টগ্রামের ভাল ব্যবসায়ী ওতিনদা এবং মনতোষ বাবুও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। পাহাড়ী গণ পরিষদ গঠনের প্রথম থেকেই জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রথম প্রথম সাড়া দিয়েছিল অনেকেই। রাঙ্গামাটির মথুরা লাল, বিজয় কেতন, বান্দরবানের হ্লাথোয়াইহ্লী, খাগড়াছড়িতে ডঃ হেমন্ত, চট্টগ্রামের বিক্রম বাবু, বকুল বাবুসহ আরো অনেকেই। অবশেষে ২৪শে ডিসেম্বর যখন আনুষ্ঠানিকভাবে গণ পরিষদের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় তখন ঢাকা থেকে সুবোধ বাবুসহ অনেকেই চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পরবর্তীতে গণ পরিষদের অনেক নেতৃবৃন্দের উপর যখন অত্যাচার, গ্রেপ্তার ইত্যাদি শুরু হয় তখন অনেকেই সরে পড়তে থাকেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ওতিনদা কৌশলে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা চালান। প্রথমে বিজয়দাকে ষড়যন্ত্র করে রাঙ্গামাটি জেলে আটক করা হয়। পরবর্তীতে মনতোষবাবু, মং খোয়াইও জেলে যায়। অন্য-দিকে ঢাকাতে সুবোধবাবুকে নানাভাবে হয়রাণী করতে গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা উঠে পড়ে লেগে গেলে গোটা সাংগঠনিক কার্যক্রমে সংকট দেখা দেয়। ওতিনদা তখন প্রায় নিস্ক্রিয় হয়ে যান। এক সময় ক্যাডেট কলেজের পুরনো বন্ধু ডি জি এফ আই এর হোমরা-চোমড়াদের মদের আসরে গিয়েও গা বাঁচিয়ে চলার আপোষকামী

ভূমিকা গ্রহণ করেন। ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্টস এর এক মেজর মওলার সাথে ওতিনদা'র বেশ উঠা বসা জমে যায় সেই মেজর ওতিনদাকে নাকি প্রায় বলত, "পাহাড়ী গণ পরিষদ করে কিছুই হবে না। ওসব করে আর্মিদের চটানো ঠিক হবে না।"

শেষ পর্যন্ত ওতিনদা ভাগ্যান্বেষণে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকা চলে গেল। স্ত্রী, পুত্র পরিজন ছেড়ে এক কালের সংগঠক কি যে হয়ে গেল! ক্যালিফোর্নিয়ার সম্ভ্রান্ত রেস্তোরায় কাজ জুটিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল বলে খবর পেয়েছিল জীবন।

উনিশ'শ নব্বইয়ের এপ্রিল মাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ জুম্ম জনগণের উৎসব মাত্র! বাংলা বছরের চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে আনন্দোৎসব চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্বাসমূহের অধিকাংশই এই বাৎসরিক সংক্রান্তি উৎসব পালন করে। শত অভাব অনটন বা দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও সবখানেই আনন্দের আয়োজন চলে। এই আনন্দ উৎসবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য ঢাকার বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্রনেতা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবি ও মানবাধিকার কর্মীকে অনুরোধ করা হয়। এতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হওয়ায় ঢাকাস্থ জুম্মদের বাসায় বাসায় ধর্ণা দেয়া হয়। ঢাকার সুবোধ বাবু সব'চে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়েছিলেন তখন। ঐ উদ্যোগে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্মা ভদ্রলোক। ১১ই এপ্রিল "ডলফিন" কোচে যখন খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করা হচ্ছিল তখনই জাতীয় দৈনিকগুলোতে লোগাং-এ একটা হত্যাকাণ্ডের প্রকাশিত খবর পেয়ে সবাই আশংকা বোধ করছিল। উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে না জানি কি হয়! খাগড়াছড়ি পৌঁছে জানা গেল ১০ই এপ্রিলে লোগাং এলাকায় সত্যিই একটা রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। শত শত নিরীহ জুম্মকে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স এর সদস্যরা গুলি করে এবং বহিরাগত বাঙ্গালী মুসলিমরা কুপিয়ে হত্যা করে। সকল আনন্দ তখন শোকে পরিণত হয়েছিল। ১২ই এপ্রিল হাজার হাজার শোকার্ত জুম্ম জনগণের শোক মিছিলের ঢল নেমেছিল খাগড়াছড়ি শহরে। আনন্দের ভাগীদার হতে এসে ঢাকার অতিথিরা শোকের অংশীদার হয়ে শোক মিছিলে সেদিন সামিল হয়েছিলেন। বিকেলবেলা খাগড়াছড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে বিশাল শোকসভার আয়োজন করা হয়। গোটা শোক সমাবেশ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন। বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর ঐ পৈশাচিক বর্বরতায় সবাই বিস্মিত বিমর্ষ না হয়ে পারেনি। ঢাকায় ফিরে গিয়ে ১৬ই এপ্রিল সুবোধবাবু জার্মানী চলে যান। হামবুর্গে তখন চলছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। হামবুর্গ থেকে প্যারিস কনভেনশন্‌... য়াম। এভাবেই দেশ থেকে দেশান্তরে। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশ। জুম্ম জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা প্রচার করতে আজো তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশে আর ফিরতে পারেননি। প্রিয় জন্মভূমি তাকে নিশ্চয়ই বারে বারে হাতছানি দেয়। আত্মীয় পরিজন, নিজের পরিবার ইত্যাদির মায়া নিশ্চয়ই তাকে ব্যাকুল করে রাখে সর্বদা। তবুও সংগ্রাম। নিরন্তর সংগ্রাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এই সংগ্রাম। প্রতিবাদের এই সংগ্রাম।

অনেক কিছুই জীবনের কাছে আজ প্রেরণাঘন স্মৃতি আর বর্তমানের সংগ্রামের মিল খুঁজে পায় না সে। স্মৃতি আর সংগ্রামের সমীকরণে কোথায় গড়মিল কোথায় যেন একটা গোলমাল থেকেই যায়। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সুবাদে অনেকের সাথে পরিচয়। অনেকের সাথে মেলামেশা এবং কাজ করার সুযোগ হয়েছে। ওভাবেই অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠতা। অতীতের অঙ্গীকারের সাথে বর্তমান ভূমিকার অনেক ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান। একই ... নিশ্চয়ই বর্তমান বক্তব্যের সাথে ভবিষ্যতের ভূমিকার সংগতি রাখতে পারবে না আজকের বহু সংগ্রামী ছাত্রবন্ধু। দেশপ্রেম, জাতপ্রেম কমবেশী সবার রয়েছে। কিন্তু ... জাতীয়তাবোধ কাউকেই প্রকৃত সংগ্রামী করতে পারে না। তাই সংগ্রামের আঁকা বাঁকা পথে চলতে চলতে অনেকেই নিজেকে আপনিই গুটিয়ে নেয়। নিজের সামাজিক অবস্থানের

... অনিবার্যভাবে আন্দোলন—সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত ... তাকে সাহায্য করে। একে একে ঘরের ছেলে ঘরে ... যেতে বাধ্য হয়। এই অমোঘ বাস্তবতা এতদিন ... ছিল না জীবনের। মনে হয় এই সত্যটি অনেকেই জানে না। অথচ এই সত্যটি জানা একান্তই জরুরী। আন্দোলনকামী কিংবা সংগ্রামরত সকল বন্ধুকে এটি অনুধাবন করতে হবে। মানব সমাজের ক্রমবিকাশ জানতে যেমন পৃথিবী সৃষ্টির আদি রহস্য জানতে হয় ঠিক তেমনি সংগ্রামের বিকাশ ঘটাতে চাইলে আমাদের সমাজের ... অবস্থাও ভালভাবেই জানতে হবে। নচেৎ গোলক ধাঁধায় পড়তে হবে অনিবার্যভাবে। কেবল রাজপথের মিছিল সমাবেশই যথেষ্ট নয়। টি, এস, সি'র অডিটোরিয়াম কিংবা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে ঝাড়া বক্তব্য দিয়েই শেষ নয়। সংগঠনের কিছু দায়িত্বশীল পথ অধিকার করলেই শেষ নয়। চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতেই হবেই। জীবন তাই আজ যে সংগ্রাম খুঁজে নিয়েছে সেই সংগ্রামের প্রকৃত ঠিকানাও খুঁজে নিতে হবে তাকে। যে সংগ্রাম আজীবন টিকে রাখবে। যে সংগ্রামে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

ভূলংতলী মৌনের চারিদিক কুয়াশায় ছেয়ে গেছে। পূর্বাকাশে তখন ভোরের পদধ্বনি। সহযোদ্ধারা যে যার আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। খুব সকালে তৈরী হয়ে নিচ্ছে ওরা। পরবর্তী গন্তব্য ফুরামৌন হয়ে চিম্বুক। চিম্বুক থেকে কেওক্রাডাং। জীবনের মনে হয় তার সারা রাত ঘুম হয়নি। হারানোর স্মৃতি আর খুঁজে পাওয়া সংগ্রামের কথা ভাবতেই দুর্গম পাহাড়ীয়া পথ অতিক্রম করতে থাকে জীবনরা।

অভিমত

পার্বত্য চট্টগ্রাম

'সরকার যুদ্ধ বিরতি পালনে অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে'

● হংসধ্বজ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বর্তমানে যে সংলাপ চলছে তার মধ্যস্থতাকারী হচ্ছেন হংসধ্বজ চাকমা। [illegible] বয়স্ক এ পাহাড়ী জননেতা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করছেন।

জনসংহতি সমিতি'র এক চিঠি নিয়ে সম্প্রতি হংসধ্বজ চাকমা ঢাকায় এসেছেন। সরকারী সূত্র জানিয়েছে জনসংহতি সমিতি সংলাপে বসার ক্ষেত্রে ওই চিঠিতে দু'টি পূর্ব শর্ত দিয়েছে—যা পালিত না হলে নির্ধারিত দিনে সংলাপ নাও অনুষ্ঠিত হতে পারে। সাপ্তাহিক সময়—শান্তি আলোচনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে হংসধ্বজ চাকমার মতামত সংগ্রহ করেছে স্বল্পস্থায়ী এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে।

সময়ঃ আমরা জানতে পেরেছি জনসংহতি সমিতি আগামী ১২ ডিসেম্বর রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন সরকারী উপ-কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছে। আপনি ঢাকা এসেছেন মূলতঃ তাদের সে সম্মতিসূচক চিঠি নিয়েই।

হংসধ্বজ চকমাঃ ১২ ডিসেম্বর বৈঠক বসতে জনসংহতি সমিতি রাজি হয়েছে এটা সত্য। কিন্তু সে বৈঠক আদৌ হবে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সরকার পূর্ববর্তী

বৈঠকগুলোতে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না। যুদ্ধ বিরতি'র লংঘন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে কোনো পদক্ষেপ নিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

সময় ঃ আপনি কি সরকারকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে দায়ী করছেন ?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ আমি নিজে প্রত্যেক আলোচনায় একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। সরকারী কমিটির অলি আহমেদ এবং উপ কমিটি'র প্রধান রাশেদ খান মেনন উভয়ই যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। জনসংহতি সমিতি'র বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ রাখা এবং তাদের গ্রেফতারকৃত সদস্যদের ছেড়ে দেয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এসব সংলাপের টেবিলেরই প্রতিশ্রুতি ও সিদ্ধান্ত। সরকার যদি তা না মানে সে দোষ তো সরকারেরই।

সময় ঃ আপনি বলতে চাইছেন সরকার জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে।

হংসধ্বজ চাকমা ঃ জনসংহতি সমিতি সে রকমই বলছে। সরকার সম্প্রতি তাদের সাতজন সদস্য আটক করেছে। আমি যতদূর জানি তারা হল—মথুর লাল ত্রিপুরা ওরফে আপন (রাঙ্গামাটি), হরিচন্দ্র চাকমা ওরফে জয়েন্ট (বরকল) মনি চাকমা ওরফে নিউটন (মহলছড়ি), মং পাইছি মারমা ওরফে পাইছি (কাউখালী), চিক্কো চাকমা ওরফে বিপিন (দীঘিনালা), অবনী কুমার চাকমা ওরফে অশেষ (রাঙ্গামাটি), ভেকেন্ট, ওরফে খীসা (রাঙামাটি)।

এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন গত আগষ্ট মাসের আগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শেষোক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে খুবই সম্প্রতি এবং তা ঘুমন্ত অবস্থায়। দীপ্তি কান্তি চাকমা নামে বাঘাইছড়ির একজন নিরপরাধ জুম্মও এদের সঙ্গে আটক হয়েছে। সরকার যুদ্ধবিরতি পালনে অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। তল্লাশী গ্রেপ্তার-হয়রাণী চলছেই। এতে সংলাপের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সময় ঃ সংলাপে বসার ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির অন্য কোনো দাবী আছে কি ?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ আমি যতদূর জানি গ্রেপ্তারকৃতদের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মুক্তি না দিলে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক বৈঠকের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে তারা রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি ও সংলাপের বিস্তারিত প্রচারও দাবী করেছে।

সময় ঃ পার্বত্য সমস্যার মীমাংসার চলতি সংলাপে অনেকগুলো বৈঠক হলো। অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু বলবেন কি ?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ আলোচনা চলছে বটে কিন্তু কার্যকর কিছু হচ্ছে না। সরকারী কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির বৈঠকগুলোতে অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় খাওয়া-দাওয়া আর পারিবারিক খোঁজ খবর দেয়া নেয়ায়। ইস্যু ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়েছে খুব কম। বরং বলা যায় উপ-কমিটির সঙ্গে কিছু গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যোগাযোগ মন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকায় দেখা করে ও কথা বলে আমার মনে হয়েছে সরকার উপ-কমিটিকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। উপ-কমিটি যেসব প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে সরকার তা পালন করতে অনীহা দেখাচ্ছে। মন্ত্রী বলছেন 'রাশেদ খান মেননের প্রতিশ্রুতি দেয়ার আগে আরও ভাবনা চিন্তা করা উচিত ছিল।' উপকমিটির নেতা রাশেদ খান মেনন কি তাহলে ঢাল-তলোয়ার বিহীন নিধিরাম সর্দ্দার ?

সময় ঃ খবর বেরিয়েছে শান্তি আলোচনার ফলাফলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক জনসংহতি সমিতি ভেঙ্গে যাচ্ছে।

হংসধ্বজ চাকমা ঃ এসব উদ্দেশ্য প্রণোদিত খবর। একটি বিশেষ মহল এসব বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমি নিজে চিঠি আদান-প্রদান করছি, আমি তো সব জানি। রূপায়ণ দেওয়ান হলেন সন্তু লারমার একেবারে দক্ষিণ হস্ত। অথচ পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছে এদের মধ্যে দ্বন্দ্বে শান্তি বাহিনী ভেঙ্গে গেছে। সুধাসিন্ধু, ঈষাতন, গৌতম এবং উপরে উল্লেখিত দু'জনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বোঝাপড়া যে, হাজার চেষ্টা করলেও তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরানো যাবে না।

সময় ঃ আপনার দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষ ভাবে দু'পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও মধ্যস্থতা করা কিন্তু অনেকে বলছেন জনসংহতি সমিতির প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।

হংসধ্বজ চাকমা ঃ জনসংহতির দাবী তো আমারও দাবী। আমি নিজে একজন জুম্ম পাহাড়ী জনগণের একজন। যদিও আমি নিরপেক্ষ দায়িত্বে আছি কিন্তু জুম্ম জনগণ তাদের অধিকার পেলে আমি নিজেও তো তার অংশ ভাগী হবো। শুধু সেকারণেই নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি যোগাযোগের কাজ করছি। শান্তি এলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তা ভোগ করবে। দেশ ও জাতির স্বার্থেই আমার আজকের ভূমিকা।

সময় ঃ এক সময় উপেন্দ্র লাল চাকমাও অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে তাঁকে। আপনার ক্ষেত্রে আবার এ রকম ঘটবে না তো ?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ আমি এ ধরণের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি বৈ কি। এ প্রসঙ্গে একজন সেনা নায়কের উক্তি বলি। তিনি বলেছেন ঃ 'সংলাপ যদি ভেঙ্গে যায় হংসধ্বজ কোথায় থাকে দেখবো।' কাজেই বুঝতে পারছেন আমার নিরাপত্তা আমাকেই খুঁজে নিতে হবে। এতো ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বে আছি যে, যে কোনো মুহূর্তে ভিন্ন কিছু ঘটে যেতে পারে।

সময় ঃ যোগাযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকায় আপনি দু'পক্ষের কেমন সহযোগিতা পাচ্ছেন ?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ জনসংহতি সমিতি থাকে জঙ্গলে তাদের দিক সহযোগিতার সুযোগ নেই। সরকারের কর্তব্য ছিল আমাকে যানবাহন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান করা। কিন্তু তার দু' আনাও পাচ্ছি না। মন্ত্রী অলি আহমদের সঙ্গে দেখা করতে হলে দশ টাকা গেটে ঘুষ দিয়ে সচিবালয়ে ঢুকতে হয়। চিঠি পত্র দেয়া নেয়া করতে গিয়ে রাস্তায় এ বুড়ো বয়সে চার বার দুর্ঘটনায় পড়েছি। একটি টেলিফোন চেয়েছিলাম দেয়া হয়নি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত উন্নয়নের নামে প্রতিদিন দেড় কোটি টাকা খরচ হয়। আমাকে সহযোগিতার জন্যে দু'জন লোক আছেন। তারও খুব কষ্টের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

সময় ঃ একটা ধারণা আছে যে, ভারতের কারণে পার্বত্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং তার প্রভাবেই সমস্যার সমাধান আটকে আছে।

হংসধ্বজ চাকমা ঃ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা। নিরীহ শরণার্থীরা জীবন বাঁচাতে ভারতে গেছে। তারা নাচতে নাচতে কিংবা বাঁশি বাজাতে বাজাতে যায় নি। আর নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় দিয়ে ভারতও কোন অপরাধ করেনি। অন্যদিকে আন্দোলন সংগ্রামকারী শান্তিবাহিনী তো ধরা পড়ছে বাংলাদেশের মাটিতেই। তারা যদি ভারতেই থাকতে তাহলে রাঙামাটি খাগড়াছড়িতে ধরা পড়ছে কেন ?

সময় ঃ আমি আসলে শান্তিবাহিনীর সহযোগিতার কথা বলছিলাম।

হংসধ্বজ চাকমা ঃ সহযোগিতা নয়, পাহাড়ীদের শেষ করেছে ভারত, এবং তা ওই '৪৭-এ। আজকে সে কাহিনী থাক।

সময় ঃ সমস্যার সমাধান পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পাহাড়ী সাংসদের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ ওরা তো আসলে আওয়ামী লীগের সাংসদ। পাহাড়ীরা '৯১ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। সুতরাং দল হিসাবে নিশ্চয়ই তার একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু সমস্যার সমাধানে তো ভূমিকা দেখছি না। বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলই আমাদের দায়িত্ব নেবে না, নিতে চায় না। পাহাড়ীদের হয় দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। না হয় বাহুবলেই তাদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। পরিস্থিতি এমন দিকেই যাচ্ছে।

সময় ঃ তার মানে চলতি সংলাপ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যতে প্রশ্নে আপনি আশাবাদী নন ?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ আশাবাদী হতে পারছি কই। জনসংহতি সমিতি তাদের দাবী দিয়েছে। কিন্তু সরকার তার বিপরীতে কোনো প্রস্তাব দিচ্ছে না। কোন কোনো প্রসঙ্গে কতটুকু ছাড় দিতে পারবে—সরকারের সেটা এখনি বলা উচিত। আলোচনার টেবিলে উভয় পক্ষের প্রস্তাব থাকলে তবেই না আপোষ মীমাংসার সুযোগ থাকে। সরকার শুধু বর্তমান জেলা পরিষদের কথা বলছেন। কিন্তু জেলা পরিষদ থাকাবস্থাতেই আন্দোলন চলছে, সংলাপ হচ্ছে। সুতরাং এটা যে কোন সমাধান নয় সেটা সরকারকে অবশ্যই বুঝতে হবে। জেলা পরিষদের বিষয়ে পাহাড়ী জনগণ অসন্তুষ্ট। এ কাঠামোর পরিবর্তন দরকার। তাছাড়া এর কোন সাংবিধানিক গ্যারান্টি নেই।

সময় ঃ সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব বলে আপনার ধারণা।

হংসধ্বজ চাকমা ঃ পার্বত্যবাসী চাইছে তাদের জনগণের সাংবিধানিক গ্যারান্টি যুক্ত একটা বিশেষ মর্য্যাদা থাক। সমস্যা যেমন আছে তার সমাধানও তেমনি আছে। সমাধানের জন্যে প্রয়োজন সদিচ্ছা। আর যে কোনো আলোচনাতে শক্তিশালী পক্ষকেই সদিচ্ছার প্রমাণ রাখতে হয়। একমাত্র তাহলেই আলোচনায় ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। উপরে আমি যা বলেছি তার সঙ্গে ভূমিস্বত্বের বিষয়টিও যুক্ত হওয়া জরুরী। কারণ পার্বত্য সংঘাতের মূল কারণ আসলে ওই জমি। সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকলে এবং আর্থিক ক্ষমতা দেয়া হলে জেলা পরিষদ কেন্দ্রীক কোনো সমাধান নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

সময় ঃ সামনেই হয়তো জাতীয় সংসদ নির্বাচন। জনসংহতি সমিতি মনোনয়ন দিলে নির্বাচন করবেন?

হংসধ্বজ চাকমা ঃ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি নির্বাচন করবে বলে মনে হয় না।

সাক্ষৎকারের এ সীমিত গণ্ডির বাইরেও পাহাড়ী নেতার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ হয়েছে অনেক। বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে যা লেখা যায় নি।

(সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন আলতাফ পারভেজ)

সৌজন্য ঃ সাপ্তাহিক সময় ২য় বর্ষ ১৬ সংখ্যা,
১৫শে নভেম্বর, ১৯৯৪ইং।

সংবাদ

জুম্ম নির্যাতন

বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার চলিত যুদ্ধবিরতি লংঘন করে বাংলাদেশ সেনারা জুম্ম নির্যাতন করে চলেছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারীতে কজয়ছড়ি ক্যাম্প কম্যাণ্ডার লেঃ ফেরদৌসী এক পরিকল্পিত অভিযানে নিম্নোক্ত জুম্মদেরকে অযথা জিজ্ঞাসাবাদ, হয়রানি ও মারধর করে এবং শান্তিবাহিনীকে সমর্থন করলে গুলি করার হুমকি দেয়। নির্যাতিতরা হচ্ছে—

১। শ্রী নোয়ারাম চাকমা (৬০, পিতা—বড়শিরা চাকমা, গ্রাম— বড় কজয়ছড়ি, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।

২। শ্রী নাজনী কুমার চাকমা (৩০), পিতা—নোয়ারাম চাকমা, ঠিকানা- ঐ।

৩। শ্রী সুমতি রঞ্জন চাকমা (৩৫), পিতা—মানেক ধন চাকমা, ঠিকানা- ঐ।

৪। শ্রী গন্ধরাজ চাকমা, ঠিকানা— ঐ ঠিকানা-ঐ

৫। শ্রী এরেইবোয়া চাকমা (২৮), পিতা—মানেক ধন চাকমা, ঠিকানা- ঐ তাকে বেদম প্রহার করা হয়।

৬। শ্রী মজাগালা চাকমা (৩০), পিতা—সত্যরঞ্জন চাকমা। ঠিকানা- ঐ তাকে বেদম প্রহার করা হয়।

জুম্ম গ্রেপ্তার

১৯শে জানুয়ারী। নানিয়ারচর থানাধীন বাঘছড়ি

ক্যাম্পের সেনারা এক অপারেশনের সময় শান্তিবাহিনী সন্দেহে ২ জন নিরপরাধ জুম্মকে আটক ও অমানবিকভাবে নির্যাতন করেছে। নির্যাতিত জুম্মরা হলো—

১। দিপ্তী বিকাশ চাকমা, গ্রাম—মরাচেঙ্গী, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি।

২। প্রতুল চাকমা, ঠিকানা- ঐ।

২ সেনা নিহত

৭ই জানুয়ারী। যুদ্ধবিরতির লংঘন করে বাংলাদেশ সেনারা অপারেশন করতে গেলে শান্তিবাহিনীর প্রতিরোধাত্মক আক্রমণে ২ জন সেনা নিহত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নানিয়ারচর থানাধীন বাকছড়ি ক্যাম্প (৪০ বেঙ্গল) হতে ১৪ জনের একদল সেনা শান্তিবাহিনী তল্লাসে প্রত্যন্ত বাকছড়ি পুরাতন জুম্ম এলাকায় জুম্মদের উপর এক অপারেশন চালাতে যায়। এ অপারেশনের সময় সেনারা জুম্মদের নানাভাবে হয়রানি করে। এই সেনারা আরো পাহাড়ের ভিতরে অগ্রসর হলে একদল শান্তিবাহিনীর সাথে মুখোমুখী হলে উভয় দলে সংঘর্ষ বাধে। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এতে ২ জন সেনা নিহত ও সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

নূতন ক্যাম্প স্থাপন

জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধবিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নূতন ক্যাম্প স্থাপন অব্যাহত রেখেছে। গত ডিসেম্বর ১৯৯৪ মাসে দিঘীনালা ক্যান্টনমেন্টের সেনারা বানছড়া গ্রামের বিনন্দচুকে একটি নূতন ক্যাম্প স্থাপন করেছে। শান্তিবাহিনীর চলাচলের ব্যাঘাত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এছাড়া বিশ্বস্তসূত্রে আরো জানা যায় যে, রাঙাপানিছড়ার প্রত্যন্ত কুদুকছড়ায় একটি ও বাঘাইছড়ির জুম এলাকার জন্য একটি ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর মৃত্যু

২২শে ফেব্রুয়ারী। আজ সকাল ৭টায় হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে আগরতলা ভিত্তিক "মানবাধিকার সুরক্ষা ফোরাম" (Humanity Protection Forum) এর সভাপতি শ্রী ভাগ্যচন্দ্র চাকমা মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা ছাড়াও বহু আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন।

শ্রী চাকমা হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরামের জন্মলগ্ন থেকে এই সংগঠনের একজন সক্রিয় সংগঠক ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ফোরামের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের মানবাধিকারের জন্য ভারত ও বিদেশে খুবই সক্রিয় ছিলেন।

সমতলবাসীর অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপন অব্যাহত

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন অব্যাহত গতিতে চালাচ্ছে। রাঙ্গামাটির পৌর এলাকার রাঙ্গাপানি মৌজার কাটাছড়ি ও গুইছড়ি (রাঙ্গামাটি কলেজে উত্তর দিক)-তে ৫০০ অনুপ্রবেশকারী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা কার্যকর হচ্ছে বলে জানা গেছে। সরকার শুধুমাত্র জুম্মদের জায়গায় নূতন অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন দিচ্ছে তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন বাঙালীদের জমিতেও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে। অতি সম্প্রতি রাঙ্গামাটি পৌর কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহায়তায় রিজার্ভ বাজার এলাকা সংলগ্ন ২০০ নূতন বাঙালী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হচ্ছে। উক্ত এলাকার পুরাতন বাঙালী অধিবাসীরা এর প্রতিবাদ জানালেও কোন কাজ হয়নি বলে জানা গেছে।

ইউ এন পি ও-কে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অনুমতি দিচ্ছে না বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের মত UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisation) এর একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক মিশন মানবাধিকার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য অনেক দিন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত বছরের

প্রথম দিকে বৃটিশ রিফিউজি কমিশনের প্রধান লর্ড এনালস্ বাংলাদেশ সফরে আসলে UNPO এর পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে স্বাগত জানাতে সরকার রাজী হয়েছিলেন। অথচ সরকারের এই সদিচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে ৯৪'-এর মাঝামাঝি UNPO বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে জুম্ম শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার মুহূর্তে জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনের অজুহাত দেখিয়ে সরকার উক্ত মিশনকে সফরের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন।

পরবর্তীতে লণ্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে বহু যোগাযোগ করার পরও কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায় নি। অবশেষে UNPO ঢাকাস্থ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের দূতাবাস সমূহের মাধ্যমে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেও বাংলাদেশ সরকারকে রাজী করাতে পারেননি। এই প্রক্রিয়ায় বৃটিশ, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও নেদারল্যাণ্ডের মিশনসমূহ যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে বলে জানা যায়।

UNPO-এর সাধারণ সম্মেলন সমাপ্ত

গত জানুয়ারী মাসের ২০ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত নেদারল্যাণ্ডের হেগে UNPO-এর চতুর্থ সাধারণ সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিবাসীদের সমস্যার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ব্যাপারেও আলোচনা হয়। ইতিমধ্যে ঢাকায় UNPO এর সেক্রেটারী জেনারেলের বেসরকারী সফর এবং ভবিষ্যতে সরকারী সফরকে ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। এবারের সম্মেলনে অংশ গ্রহণ এবং লিখিত বক্তব্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরেন জ্যোতিরিন্দ্র চাকমা।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের ত্রিপুরা সফর

৩রা ফেব্রুয়ারী। গত ১লা ফেব্রুয়ারী সাব্রুম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ, রাশেদ খান মেনন (সাংসদ) ও কল্পরঞ্জন চাকমা (সাংসদ) ত্রিপুরায় অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদের শিবিরে ২ দিনের পরিদর্শনে যান। সাব্রুমে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মজুমদার, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী ও দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক অলক কুমার দেব প্রমুখ। বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার নজিবুল্লাহও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের এই সফরের সময় জুম্ম শরণার্থীরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সাব্রুমের কাঠালছড়ি শিবিরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানালে ও তাকুমবাড়ী ও করবুক শিবিরে জুম্ম শরণার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিভিন্ন শিবিরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জনাব অলি আহম্মদ জুম্ম শরণার্থীদের যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে দাবী করেন। অপরপক্ষে জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ প্রত্যাগতদের যথাযথ পুনর্বাসন না করার ও হয়রানি করার অভিযোগ উত্থাপন করেন। এই সফরের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্যপাল শ্রীরমেশ ভাণ্ডারী ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দশরথ দেবের সঙ্গে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই দিনই প্রতিনিধিরা আথাউড়া সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও আর্মিদের সামরিক অভিযানের বিরতি নেই

(১)

৪ঠা ডিসেম্বর '৯৪ হতে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর থানা ও বন্দুকভাঙ্গা এলাকার মাচ্যাপাড়া, কুড়ামারা, টিবিরাছড়া, দ্বিমুখ্যাছড়া, যমচুক ও শৈলেশ্বরী গ্রামে নানিয়াচর জোনের আর্মিরা সাড়াশী অভিযান চালায়। একই মাসের ২০ তারিখ লক্ষীছড়ি সদর জোন থেকে ২৬ ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের (ই বি আর) একটি সেনাদল ক্যাপ্টেন ফুয়াদের নেতৃত্বে বানরকাটা

এলাকায় ব্যাপক সামরিক অভিযান চালায়। অন্যদিকে ২২ ডিসেম্বর উক্ত থানাধীন ধূল্যাতলী আর্মি ক্যাম্পে জুম্ম গ্রামবাসীদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে মিটিং করে এবং জনৈক সেনা কর্মকর্তা গ্রামবাসীদের নানাভাবে হুমকি দেয়।

(২)

মহালছড়ি থানার জোন (২৩ ইবিআর)-এর একদল সেনাবাহিনী ৪ঠা জানুয়ারী '৯৫ ক্যায়াংঘাট, উল্টাছড়ি, আজাছড়া ও মধ্য আদাম আর্মি ক্যাম্পের অন্য আরেক টি সেনাদলের সাথে মিলিত হয়ে সাতঘরপাড়া এবং মধছড়া এলাকায় ব্যাপক সামরিক অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় আর্মিদের সাথে ২০।২৫ জনের একটি অনুপ্রবেশকারীর দলকেও থাকতে দেখা যায়। উক্ত সেনাদলটি মুবাছড়ি, লবাপাড়া, কলাবন্যাপাড়া ও আশে-পাশের জায়গায় টহলদারী অভিযান পরিচালনা করে। ৬ই জানুয়ার '৯৫ নানিয়ারচর জোন হতে ৪০ ইবিআর এর একদল আর্মি বগাছড়ি, ঘিলাছড়ি, জুরাছড়ি ও কুতুক-ছড়ি আর্মি ক্যাম্প হতে অন্য একটি দল মিলে বামের বগাছড়ি, ছৈ-ছড়ি, ঘিলাছড়ি ও চৈঙাছড়িতে সামরিক অভিযান চালায়। ৯ই জানুয়ারী '৯৫ মহালছড়ি জোনের আর্মিরা পাগজ্যাছড়ি, বদান'ল, লেমুছড়ি ও মুনি-রাম কার্বারী পাড়ায় এবং ১০ই জানুয়ারী ঘাগড়া জোনের বাদলছড়ি ক্যাম্পের আর্মিরা উক্ত জোনের পানছড়িতে কম্বিং অপারেশন চালিয়েছে বলে জানা যায়। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে জনসভা করার পূর্বের চক্রান্তও চালানো হচ্ছে। গত ১৫ই জানুয়ারী '৯৫ নানিয়ারচর জোন সদর দপ্তর থেকে জোনাল কম্যাণ্ডারের পক্ষে মেজর আব্দুল সালাম তালুকদার স্বাক্ষরিত (৬১০।৬। অপস) চিঠিতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ২১শে জানু-য়ারী শনিবার সকাল ১১০০টায় সেনা ক্যাম্পে অবশ্যই উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উক্ত আলোচনা সভায় কম্যাণ্ডিং অফিসার পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরি-স্থিতির আলোকপাত করেছেন বলে জানা যায়।

(৩)

জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলার সুবলং আর্মি ক্যাম্প হতে একদল আর্মি কড়ল্যামুড়া ও চিলারডাক এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় আর্মিরা লালমনি চাকমার বিরাট শনের ক্ষেত আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। ১৫ই জানুয়ারী অপর এক ঘটনায় ঘাগড়া জোনের কুতুকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের আর্মিরা লেঃ নঈম এর নেতৃত্বে কুতুকছড়ি মধ্যপাড়ায় এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পশু চাকমা (২১) পীং—সুশীলকান্তি চাকমা ও বাঙাল্যা চাকমা (২০) পীং—সদক্যা চাকমা নামক দুই যুবককে ধরে ক্যাম্পে নির্য্যাতন চালায়। ১৯শে জানুয়ারীর অন্য এক ঘটনায় উপরোক্ত সেনাদল দয়ালমোহন চাকমা (২২) পীং—মঙ্গল কুমার চাকমাকে গ্রেপ্তার করে এবং শারিরীক নির্যা-তনের পর ছেড়ে দেয়।

(৪)

বরকল থানার অন্তর্গত বরণাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ২৩ শে জানুয়ারী '৯৫ রূপবান পঞ্চায়েতের সভাপতি কৃপাঞ্জন চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে এবং তার অনুপস্থিতিতে বাড়ীতে তল্লাসী চালায়। ক্যাম্পে ফেরার পথে আর্মিরা উক্ত গ্রামের প্রেমলাল চাকমা পীং—সাধন কুমার চাকমা ও অশ্বথমা চাকমা পীং—চিজি চাকমাকে মারপিট করে চলে যায়। ২৭ জানুয়ারী অপর এক ঘটনায় রাঙ্গামাটির ছোট কাট্টলী ক্যাম্প হতে লেঃ আলী হোসেনের নেতৃত্বে একদল আর্মি (২১ ইবিআর) বরকল নামক জায়গায় এক জুম্ম দোকানে হানা দেয়। দোকান মালিক জুম্ম ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কিছুই না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দোকানে আগত সকল জুম্মদের সূর্যের দিকে মুখ করে থাকতে নির্দেশ দেয়। এভাবে ২ ঘণ্টা শাস্তি প্রদানের পর আর্মিরা চলে যায়। একই দিনে বরণাছড়ি ও সুবলং আর্মি ক্যাম্প হতে একদল সেনাবাহিনী দীঘলছড়ি, রূপবান ও পানছড়ি পাহাড়ীয়া এলকায় অবস্থান নেয়। সেখানে অবস্থানকালে আর্মিরা রনিয়া চাকমা (২৫) পীং—সারাধন চাকমা, গ্রাম-ঢেবাছড়া ও মির্গ চাকমা (১৬) পীং—ইন্দ্রসেন চাকমা, গ্রাম-রূপবান

নামক দুই জুম্ম যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং শারীরিক নির্যাতন চালায়।

(৫)

নানিয়ার-জোন (৪০ ইবিআর)-এর লেঃ হানিফের নেতৃত্বে ৩০শে জানুয়ারী '৯৫ উক্ত থানাধীন লারমা-পাড়া, জোরবুয়া মহাজনপাড়া ও টিবিরাছড়িতে টহলদারী অভিযান পরিচালনা করে। আর্মিরা ১লা ফেব্রুয়ারী '৯৫ আরো গভীর অরণ্যে গিয়ে জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ২রা ফেব্রুয়ারী লারমাপাড়ায় কয়েকটি জুম্ম বাড়ীতে আগুন জ্বলিয়ে দেয় টিবিরাছড়ি ও জোরবুয়া মহাজনপাড়ায় কিছু লুটতরাজ চালায়। উক্ত দুই গ্রামের সকল জুম্ম নরনারীকে জোরপূর্বক বেতছড়ি নামক অন্য গ্রামে জড়ো করে মিটিং করে। একই মাসের ৬ তারিখ লক্ষীছড়ি জোন থেকে লেঃ ফেরদৌসের নেতৃত্বে ১১ জন সেনার একটি দল বামের বগাছড়িতে সামরিক অভিযান চালানোর সময় প্রতুল চাকমা পীং কালাচান চাকমাকে লক্ষ্য করে লেঃ ফেরদৌস নিজেই গুলি ছুঁড়ে। সৌভাগ্য-ক্রমে প্রতুল চাকমা বেঁচে যান। তবে গুরুতর আহত হয়েছেন। এই সেনাদলের সদস্যরা অপর পাঁচজন নিরপরাধ জুম্মকে নির্যাতন করে। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন—

১। লাল বিহারী চাকমা (৪৫) পীং-চিত্র কুমার চাকমা, গ্রাম-বামে বগাছড়ি, থানা—নানিয়ারচর।
২। সূর্যসেন চাকমা (৭০) পীং-কামেস চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঐ
৩। শান্তি বিজয় চাকমা (২৮) পীং-সূর্যসেন চাকমা, গ্রাম-ঐ
৪। গোবিনী কান্ত চাকমা (৬০) পীং-ডালমনি চাকমা, গ্রাম ডানে বগাছড়ি, থানা-ঐ
৫। অগ্রবংশ ভিক্ষু, ঘিলাছড়ি বিহারাধ্যক্ষ, থানা-ঐ

জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর

গত ১৫—১৬ই মার্চ ত্রিপুরায় অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। এই সফরকারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ ও বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রীউপেন্দ্র লাল চাকমা। এ ছাড়া প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ডি এম সহ দুইজন উচ্চ পদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তা। এই সফরকারী দলটিকে সাংসদ শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও খাগড়াছড়ি জেলার ডি সিসহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা রামগড়ে অভ্যর্থনা জানান।

এই দুইদিনের সফরকালে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, দিঘীনালা ও মেরুং এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা সরকারী প্রতিশ্রুত ১৬ দফা বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ সম্বলিত স্মারকলিপি শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমার নিকট পেশ করে। পেশকৃত স্মারকলিপিতে প্রত্যাগতদের ভূমি ফেরত প্রদান না করা সহ চাকুরী ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি পূরণ না করা ও অত্যাচার করার অভিযোগ করা হয়।

দু'দিন সফরের পর জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ রামগড় হয়ে আবার ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে ফিরে যান। এই সফরের শেষে শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রত্যাগতদের পুনর্বাসন ও ১৬ দফা বাস্তবায়ন না করার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গত ৫ই এপ্রিল তাদের সফরের বিবরণ দিয়ে এক লিখিত রিপোর্টে সরকারী প্রতিশ্রুত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়ন না করার অভিযোগ করেন ও প্রতিশ্রুত ১৬ দফা বাস্তবায়নের দাবী জানান।

প্রত্যাগত শরণার্থী কিশোরী ধর্ষিতা

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা থানাধীন সঙ্গপাড়া (তাইন্দং)তে ভারত থেকে প্রত্যাগত এক ত্রিপুরা কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ঘটনাটি গত ফেব্রুয়ারী মাসের ষোল তারিখ সংঘটিত হয়। মিস শোভারাণী ত্রিপুরা (১৬) পিতা—বীরঙ্গ ত্রিপুরা ঘাটে পানি আনতে গেলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বাঙ্গালী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী উক্ত পাশবিক আক্রমণ চালায়। ঘাটের আশোপশে লোকজন না থাকায় অপরিচিত ঐ বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকারী নির্বিঘ্নে

ধর্ষণ চালানোর পর গা ঢাকা দেয়। অসহায় শোভা-রাণী বাড়ী ফিরে পিতা বীরঙ্গ ত্রিপুরাকে ঘটনাটি জানালে স্থানীয় বি. ডি. আর. ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার (সি. ও.) এর কাছে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু উক্ত জামিনি পাড়া বি. ডি. আর. ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ না নিলে বীরঙ্গ ত্রিপুরা থানায় কেইস করতে যান। কেইস করার কথা জানার পর বি. ডি. আর. ক্যাম্পের সি ও. বীরঙ্গ ত্রিপুরাকে বাধা দেন এবং কেইস না দেয়ার জন্য বীরঙ্গ ত্রিপুরাকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। ভারতের নিরাপদ শরণার্থী শিবির থেকে সরকারী আশ্বাসে দ্বিতীয় দফায় স্বদেশে ফিরে এসে ধর্ষিতা কিশোরী শোভারাণী ও তার বাবা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

পানছড়িতে জুম্ম কিশোরীর শ্লীলতাহানী

গত ১৪ই মার্চে প্রত্যাগত এক জুম্ম কিশোরীর শ্লীলতা হানির খবর পাওয়া গেছে। ভারতের ত্রিপুরা থেকে আসা পার্বত্য চট্টগ্রাম সফররত জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধি দলের নিকট এই জুম্ম কিশোরীকে হাজির করে এই শ্লীলতা হানির অভিযোগ করা হয়। এদিন মিস টুক্কালা চাকমা (১৪) পীং নগেন্দ্র চাকমা সাং—কালনাল, কুয়াঘাট থেকে পানি আনতে গেলে পার্শ্ববর্তী দমদমা পাড়ার মোঃ আজিজ পীং আকবর তাকে ধর্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও জুম্মদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তকারী দলটি এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে নগ্ন হামলা

গত ১৫ মার্চ বান্দরবনে বাংলাদেশ পুলিশ ও পার্বত্য গণপরিষদের যৌথ হামলায় এক জন জুম্ম ছাত্র নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। এছাড়া ২২জন জুম্ম ছাত্রকে গ্রেপ্তার ও শতাধিক জুম্ম ছাত্র নিখোঁজ রয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এদিন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান রাজবাড়ী মাঠে পরিষদের জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্র পরিষদের এই গণতান্ত্রিক সম্মেলনকে বানচাল করতে সরকারী মদতপুষ্ট অনুপ্রবেশকারীদের নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য গণপরিষদ একই সময়ে ঐ স্থানে এক ষড়যন্ত্রমূলক সভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। এতে জুম্ম ছাত্রদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমান বাঙ্গালীদের এক সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই সম্ভাব্য সংঘর্ষের অছিলায় স্থানীয় প্রশাসন সেদিন রাজবাড়ী মাঠ এলাকায় আবার ১৪৪ ধারা জারী করে যাতে জুম্ম ছাত্রদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে না পারে। কিন্তু এদিন শত শত জুম্ম ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে রাজবাড়ী মাঠে সম্মেলনে মিলিত হয়।

এই সম্মেলন চলাকালে এক পর্যায়ে সরকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মদতে পার্বত্য গণপরিষদের গুণ্ডারা জুম্ম ছাত্র জনতাকে আক্রমণ করে। প্রথম অবস্থায় জুম্ম ছাত্র জনতা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। জুম্ম ছাত্র জনতার এই প্রতিরোধ ধ্বংস করতে অবশেষে পুলিশবাহিনী কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি করে জনৈক রণধীর চাকমাকে হত্যা ও শতাধিককে আহত করে। এছাড়া রিক্তন চাকমা (খাগড়াছড়ি)সহ ২২ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ও শতাধিক ছাত্র নিখোঁজ রয়েছে।

পার্বত্য গণপরিষদের গুণ্ডাদের প্রবল হামলা ও পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে জুম্ম ছাত্র জনতা জুম্ম অধ্যুষিত মধ্যম পাড়া, উজানি পাড়া ও রাজবাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে মুসলমান বাঙ্গালীরা জুম্ম ছাত্র জনতাকে ধাওয়া করে এইসব এলাকায় ঢুকে লুটতরাজ ও ঘরবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে দুইশতাধিক ঘরবাড়ী পুড়ে যায়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই গণতান্ত্রিক সম্মেলনে পুলিশ ও অনুপ্রবেশকারী মুসলিম গুণ্ডাদের এই হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে ১৫ই মার্চে চট্টগ্রামে জুম্ম ছাত্রদের এক প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এই ঘটনার প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্ররা খাগড়াছড়িতেও প্রতিবাদ মিছিল করে।

গত ২৩ মার্চ দেশের ৪৫ জন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি এক যুক্ত বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, বান্দর-

বানে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পরোক্ষ সহযোগিতায় একদল দুবৃত্ত পাহাড়ী ছাত্র-জনতার উপর হামলা চালিয়ে বহু জনকে আহত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, এই জাতীয় ঘটনায় দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা জিইয়ে রাখা হবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রহমান, বিচারপতি কে, এম, সোবহান, ডঃ কামাল হোসেন, ডঃ আহম্মদ শরীফ, ডঃ হুমায়ুন আজাদ, শুধাংশু শেখর হালদার প্রমুখ। একই তারিখে আরো ১৫টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুরূপ এক বিবৃতিতে এ-ঘটনার নিন্দা জ্ঞাপন, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও দোষীদের শাস্তির দাবী জানান।

এছাড়া মানবাধিকার কর্মী আইনজীবি ও সাংবাদিকদের সমন্বয়ে ১২১ জন সদস্য বিশিষ্ট এক তদন্ত দল বন্দরবান সফর করে গত ১৮ই মার্চ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এ সম্মেলন তদন্তকারী দলটি এই ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ ও প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

আমরা সর্বহারা—আমাদের অহংকার করার কিছুই নেই

—এম, এন, লারমা

"যে যত আদর্শবান, সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শী হতে পারে।"

—এম, এন, লারমা

"পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান"

— জনসংহতি সমিতি

"পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা) ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংকো, খুমি, রিয়াং, মুরুং ও চাক এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ী বা 'জুম্ম' বলি "

—এম, এন, লারমা

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।